

দক্ষিণবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী কাঁকড়াবুড়ির মাহাত্ম্য

পল্লবী সরদার

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/07/19_Pallabi-Sardar.pdf

সারসংক্ষেপ: শাস্ত্রানুসারে সাধারণত যে-কোনো পূজা পার্বণে একটি নির্দিষ্ট আচার-বিধি গড়ে উঠেছে, বিশেষত অঞ্জলিভিত্তিক এলাকায় পুজোর দিনটিতে নিরামিষ রন্ধন হয় বা কোথাও সেই দিনটি অরন্ধন পালিত হয়। দক্ষিণচব্বিশ পরগনা জেলার নামখানার প্রসিদ্ধ লোকদেবী ‘কাঁকড়াবুড়ি’ ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ করা যাচ্ছে। সেখানে পুজো পদ্ধতি থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রেই নিয়মরীতির পরিবর্তন রয়েছে। সেখানকার (নামখানার) উপাস্য দেবীর পূজা হয় তন্ত্র মতে। নদী থেকে সমুদ্রের কাঁকড়া উঠে না এলে পুজো শুরুরই হবে না। নৈবেদ্য দেওয়া হয় আমিষ খাবার। ৬৫ বছরের প্রসিদ্ধ এই মন্দির জুড়ে জড়িয়ে রয়েছে এমনি নানান কাহিনি। এই পুজোকে কেন্দ্র করে এক মাস ব্যাপি মেলার আয়োজন হয়, দূর-দূরান্ত থেকে পূর্ণাখীরা মন্দিরে জমায়েত হন নিজ নিজ মনস্কামনা পূরণের জন্যে। কিন্তু সমাজ সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে মানুষের চিন্তা চেতনার। আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ এখন দৈবীক চিন্তাধারাকে পিছনে ফেলে এসেছে ঠিকই, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নিজেদের পিতৃপুরুষের তৈরি সংস্কারকে একেবারে শিকড় থেকে নির্মূল করতে পারেনি। বাংলার বহু জায়গায় গড়ে ওঠা লৌকিক দেব-দেবীরা মানুষের বিশ্বাসের উপর নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন, যদিও তাঁদের পূর্বাকৃত মাহাত্ম্যের রকমফের ঘটেছে বৈকি। সমীক্ষার মাধ্যমে এই সকল ঘটনার নেপথ্যের কারণসমূহগুলি আলোচ্য প্রবন্ধটিতে আলোচিত হয়েছে।

সূচক শব্দ: কাঁকড়াবুড়ি, শঙ্খচিল, ওলাইচন্ডী, মারিয়ম্মান, অপ, মাহাত্ম্যের রূপান্তর, জলাভিমানিনী দেবী, সিঁদুরলিপ্ত পাথরখণ্ড, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, জ্বরাসুর, গুটি বসন্ত (স্মল পক্স)।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণচব্বিশ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের অন্তর্ভুক্ত শিবনগর (দক্ষিণ-পূর্ব) আবাদ গ্রামের ঐতিহ্যবাহী প্রসিদ্ধ মন্দির ‘কাঁকড়াবুড়ির মন্দির’। প্রায় ৬৫ বছর ধরে কাঁকড়াবুড়ি এই গ্রামে বসবাস করছেন ও গ্রামবাসীবৃন্দের নানা রোগ-শোক, বিপদের হাত থেকে রক্ষা করছেন। এই মন্দির কেন্দ্রিক একটি মিথ জড়িয়ে আছে। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে কাঁকড়াবুড়ির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী শিবনগর আবাদ এলাকার পার্শ্ববর্তী স্থানে একটি পক্-মিল বা ইট-ভাটা তৈরি হয়, সেখানে বহু শ্রমিক দূর-দূরান্ত থেকে কাজ করতে আসতেন। একদিন হঠাৎই শ্রমিকদের বাচ্চাদের মধ্যে গুটি বসন্তের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় ও তারা মারা যেতে থাকে। এরপর থেকেই গ্রামের সকলে অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকে এবং এটি মহামারীর আকার নেয়। বহু মানুষ কলেরা, ডায়রিয়া, বসন্ত, হাম ইত্যাদি রোগে মারা যেতে থাকে এবং ধীরে ধীরে গোটা গ্রাম উজার হতে শুরু হয়। সেই সময় গ্রামের ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিরা চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং একত্রে আলোচনার মাধ্যমে মনোনীত করেন বসন্তের দেবী শীতলাকে আরাধনা করার জন্য। এবং মন্দিরের বর্তমান সেক্রেটারি দয়ালচন্দ্র সামন্তের পিতা কার্তিকচন্দ্র সামন্ত ও জ্যাঠামশাই নরেন্দ্রনাথ সামন্ত-সহ গ্রামের আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ একত্রে মায়ের পূজার জন্য পরামর্শ নিলেন তাঁদের পরিচিত মেদিনীপুরের মহিষাদলের পুরোহিত শ্রী কালিপদ উচ্ছাসিনী মহাশয়ের কাছে। কালিপদবাবুর মতানুসারে গ্রামের তেমাথায় (তিন মাথার মোড়) মন্দির প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই মতোই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ফাল্গুন মাসের অষ্টমী তিথিতে (পঞ্জিকা মতে) পুজো সম্পন্ন করেন কালিপদ উচ্ছাসিনী। পুজোর পরপরই অলৌকিকভাবে মহামারীর প্রকোপ কমতে শুরু করে, বাচ্চারা-সহ আক্রান্ত ব্যক্তিরা সুস্থ হয়ে ওঠে এবং গ্রামের

মানুষ নিরোগ ও সুস্থভাবে বসবাস শুরু করেন।

মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরপরই নানান ঘটনা ঘটতে থাকে, প্রতিষ্ঠিত পুজোর দিন লক্ষ করা যায় মন্দিরের পেছনে সবরিকা দোয়ানিয়া নদী থেকে ঘটোত্তোলনের সময় অদ্ভুত ভাবে সামুদ্রিক কাঁকড়া নদী থেকে উঠে মন্দিরের দিকে আসতে শুরু করে এবং মন্দিরের চূড়ার উপরে একটি চিল চরকি পাক আকারে ঘুরতে থাকে, এই চিলকে স্থানীয় বাসিন্দারা শঙ্খচিল বা চট্টীচিল নামে আখ্যা দিয়েছেন। এই ঘটনা প্রত্যেক বছর বাৎসরিক পুজোর সময় ঘটে থাকে, বছরের অন্য কোনোদিন বা অন্য কোনোপুজোতে এই ঘটনা ঘটতে দেখা যায় না, কাঁকড়াও উঠে আসে না। কেবলমাত্র বাৎসরিক পুজোতেই কাঁকড়া উঠে আসলে তবেই পুজো শুরু হয়। সেই থেকেই শীতলার নাম হয় ‘কাঁকড়াবুড়ি’। এছাড়াও এর কারণ স্বরূপ আরো একটি তথ্য জানা যায়, শিবনগর আবাদ গ্রামটিতে মৎস্যজীবীদের বসবাস ছিল একটা সময়, তাই সাধারণভাবেই তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা পৌরাণিক দেবী শীতলার সঙ্গে মাছ-কাঁকড়ার প্রসঙ্গটি জড়িয়ে যাচ্ছে সাধারণত লোককথার মাধ্যমে। আনুমানিক ৬৪-৬৫ বছর ধরে এই ঘটনাটি ঘটে আসছে শিবনগর আবাদ গ্রামে শীতলা পুজোর সময়। প্রত্যেক বছর পঞ্জিকা মতে পুজোর ঘটোত্তোলনের যে সময় নির্ধারণ হয় সেই সময়ই ঘটোত্তোলন করতে হবে। তা না হলে ওই শঙ্খচিল বা কাঁকড়া কোনোটারই হৃদিস পাওয়া যাবে না, ফলে সেই বছর পুজো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

স্বভাবতই প্রত্যেক বছর ফাল্গুন মাসের শেষে বা চৈত্রের শুরুতে (পঞ্জিকা অনুসারে) বার্ষিক পুজো শুরু হয়, সকাল নটা থেকে দশটার মধ্যে। প্রতি বাৎসরিক পুজোয় দেবী শীতলার রূপসজ্জার আয়োজন থাকে, নতুন বস্ত্র ও অলংকারের সাহায্যে নবরূপে সজ্জিত হন শিবনগর আবাদ এলাকার উপাস্য দেবী। দূর-দূরান্ত থেকে ভোগ প্রস্তুত করার জন্য রান্নার ঠাকুর আনা হয়। মায়ের নৈবেদ্যের থালা সাজানো হয়, অন্নভোগ সঙ্গে পাঁচ রকম ভাজা, ডাল, বিভিন্ন সবজির তরকারি, একটা তেঁতো তরকারি, মাছ (পোনা, ইলিশ, ভেটকি, কোনোরকম জিঙল মাছ দেওয়া হয়না), কাঁকড়ার তরকারি, চাটনি, ক্ষীর ভোগ, মিষ্টান্নে। এই পূজায় কোনো বলি প্রথার নিয়ম নেই। বহুদূর থেকে ভক্তরা আসেন পূজা দিতে, তাঁদের মনস্কামনা পূরণ হলে দেবীর উদ্দেশ্যে দণ্ডী কাটেন, ধুনো-পোড়ান, পুষ্পাঞ্জলি দেন। যে যার সাধ্যমত পূজার ডালা সাজিয়ে নিবেদন করেন। বাৎসরিক পুজোর শুরুর দিন দণ্ডী কাটেন প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ জন ভক্ত, দণ্ডী কাটা সময় শুরু হয় বেলা বারোট্টা থেকে এবং চলতে থাকে আড়াইটে-তিনটে পর্যন্ত, এই নিয়ম চলে দুই থেকে তিন দিন ধরে; প্রথম দিনের তুলনায় দ্বিতীয় দিন থেকে ভক্তদের ভিড় কমতে থাকে আনুমানিক ৫০ থেকে ১০০ জন দণ্ডী কাটেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। পুজো চলে এক সপ্তাহ ধরে। পাথরপ্রতিমা, সাগর, ক্যানিং, কাকদ্বীপ এছাড়া বিভিন্ন জেলা থেকে ভক্তের আগমন ঘটে এই পূজায়। পূজার দিনগুলিতে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ জন ব্রাহ্মণ ভোগ রান্না করেন। মায়ের প্রসাদ বিতরণ করা হয় ৭০ থেকে ৮০ পরিবারকে ও ক্ষীরভোগ প্রস্তুত করা হয় আনুমানিক ৩০০ পরিবারের জন্য। এই পুজোর দায়ভার থাকে মেদিনীপুর থেকে আগত পুরোহিত কালিপদ উচ্ছাসিনীর পরবর্তী বংশধরদের উপর, তাঁরাই বংশপরম্পরায় এই পুজোর পৌরহিত্য পালন করে আসছে। বর্তমানে মায়ের বাৎসরিক পূজার দায়িত্ব পালন করে কালিপদ উচ্ছাসিনীর পুত্র তারাপদ উচ্ছাসিনী। তবে মায়ের পূজার রীতি নিয়ে মতান্তর রয়েছে, অনেকের মতে তন্ত্রমতে কাঁকড়াবুড়ির আরাধনা হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে মন্দিরের পুজো ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি অনুযায়ী শীতলার স্তোত্র বা ধ্যান মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে হয়ে থাকে —

“ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।

মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্।

শীতলে ত্বং জগন্মাতা শীতলে ত্বং জগৎপিতা।

শীতলের ত্বং শীতলায়ৈ নমো নমঃ।।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাঁকড়াবুড়ির মন্দিরে দেবী শীতলার পাঁচটি রূপের মূর্তি রয়েছে, যথা — বাম দিক থেকে দুটি মূর্তির গাত্রবর্ণ হালকা সবুজ রঙের ও ডান দিক থেকে দুটি মূর্তিরও বর্ণের রং হালকা সবুজ, মধ্যবর্তী দেবীর গাত্র শ্বেতবর্ণ। প্রচলিত মূর্তি অনুসারেই এখানে দেবী অধিষ্ঠিত রয়েছেন। প্রত্যেকটি দেবীর এক হাতে বাঁটা রয়েছে ও অন্য হাতে কলসি কাঁকে, গাধার উপর বসে আছেন। কাঁকড়াবুড়ির বিশেষ মাহাত্ম্য হলো, মায়ের ঘটের জল দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা নিজেদের বাড়ির জন্য নিয়ে যান, তাদের বিশ্বাস এই ঘটের জল বাড়ির চারপাশে ছিটিয়ে দিলে রোগ-ব্যাদি নাশ হবে ও ঘরের শান্তি বজায় থাকবে। এমনকি কোনোবাড়িতে বসন্ত রোগ-সহ যে-কোনো দুরারোগ্য ব্যাধির ক্ষেত্রে মায়ের ঘটের জল নিয়ে যান বাড়ির লোকেরা রোগীর সুস্থতা কামনার্থে। তাদের বিশ্বাস এই ঘটের জল রোগীদের সুস্থ করে তুলবে। এই মন্দিরে মায়ের পুজোয় মানসিক পূর্বক বিশেষ কোনো ‘ছলন’ দেওয়ার রেয়াজ নেই। তবে অনেক ভক্তরাই মায়ের মূর্তির অবয়বের ‘ছলন’ দিয়ে থাকে এবং প্রতি বছর ওই মানদ মূর্তি সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায়কুড়ি থেকে ত্রিশটা। চিত্রে মায়ের পীতলের যে মূর্তিগুলি রয়েছে অনেক ভক্তরা তা ‘ছলন’ হিসাবে দিয়েছে। এছাড়াও অনেকের মনস্কামনা পূরণের দরুন নিজেদের বাড়ির হাঁস-মুরগির ডিমও দিয়ে থাকেন।

মায়ের বাৎসরিক পুজো ছাড়াও প্রতি সপ্তাহে শনিবার ও মঙ্গলবার পূজা হয়ে থাকে, এদিন ভক্তদের ভিড় তুলনামূলক বেশি থাকে অন্যদিনের তুলনায়। প্রতিদিন সন্ধ্যা আরতি হয়, বছরে মায়ের বিশেষভাবে চারবার পুজো হয়ে থাকে, যথা — ফাল্গুন মাসে বাৎসরিক পুজো, পয়লা বৈশাখের দিন, জন্মাষ্টমী ও রাধা অষ্টমীতে বিশেষভাবে মায়ের আরাধনা হয়। এই পূজায় মায়ের নৈবেদ্যে অন্নভোগ দেওয়া হয় না, মায়ের নৈবেদ্যের থালি সাজানো হয় চিড়ে, দই, মিষ্টান্ন ও ফলমূল সহযোগে, জন্মাষ্টমীতে বিশেষ করে তালের নানান রকম ভোগ দেওয়া হয়, যেমন তালের বড়া, তালের পিঠে, মালপোয়া, নাড়ু, পায়েস ইত্যাদি। এই দিনগুলিতে ভক্তদের আগমন ঘটে দূর-দূরান্ত থেকে। সবথেকে বড়ো পূজা অনুষ্ঠিত হয় বাৎসরিক পুজোতে, পূজা এক সপ্তাহ চললেও এই পূজা কেন্দ্রিক মেলা ও উৎসবের মহল গড়ে ওঠে একমাস ধরে।

বাংলায় সাধারণত পূজা-কেন্দ্রিক বহু মেলা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। মেলা হলো বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী আনন্দ উৎসব যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে একছত্রে বেঁধে রেখেছে যেমন একাধারে, অন্যদিকে এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ভারসাম্যকে বজায় রেখেছে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে বহু মানুষ তাদের রোজগারের একটি পথ খুঁজে পায়। খাবারের দোকান-সহ, নানান আসবাবপত্রের দোকান, বাচ্চাদের খেলনার দোকান, বিভিন্ন ফুল গাছের দোকান ইত্যাদি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা মেলা পার্বণের মাধ্যমে নিজেদের অর্থ উপার্জন করে থাকেন। এছাড়া নানান সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ দৈনন্দিন একঘেয়ে কর্মজীবন থেকে মুক্তির পথ ও বাঁচার রসদ খুঁজে পায়। একটা মেলা মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটায় পারিবারিক ও সামাজিকগত ভাবে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করে। হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতি লোকশিল্প এই মেলার মাধ্যমে টিকে রয়েছে বহু জায়গায়, যেমন মাটির তৈরি পুতুল, হাতের তৈরি ঘর সাজানোর আসবাবপত্র, কাঁথা স্টিচের বস্ত্র-সহ নানান সৌখিন জিনিসপত্র বিক্রি হয়, হাতে বানানো নানান রকম অলংকার ইত্যাদি। এছাড়া যাত্রাপালা, মনসার গান, শীতলার গান, হরিনাম-সংকীর্তন ইত্যাদি বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি বর্তমানে বিলুপ্তির পথে, প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলায় একমাত্র এই ঐতিহ্য বজায় রয়েছে। শিবনগর আবাদ এলাকা এর ব্যতিক্রম নয়, কাঁকড়া বুড়িরপুজো উপলক্ষে পূজা কমিটির পক্ষ থেকে সামাজিক কাজ আয়োজিত হয়। যেমন ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, বাংলার নানান সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাচ-গান, আবৃত্তি, যাত্রাপালা, বাংলার লুপ্ত প্রায়সংস্কৃতি গাজন পালাও অনুষ্ঠিত হয় এই মেলাকে কেন্দ্র করে। প্রায় হাজার দেড়-হাজারেরও বেশি ভক্তের আগমন ঘটে দূর-দূরান্ত থেকে এই মেলা কেন্দ্রিক উৎসবে যোগদানের জন্যে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পৌরাণিক কাহিনি মতে, লৌকিক দেবী শীতলা হলেন দেবী কাত্যায়নীর আরেক রূপ। ঋষি কাত্যায়নের কন্যা

কাত্যায়নী জ্বর আক্রান্ত রোগীদের শীতলতা প্রদান করেন। শীতলা কথার আক্ষরিক অর্থ সংস্কৃতে ‘শীতল হওয়া’। দেবীর মহাত্ম্য অনুসারে পৃথিবীর সমস্ত অহংকারী দুষ্ক-পৈশাচিক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য দৈত্যরাজ কালকেয় দ্বারা প্রেরিত অসুরদের হত্যা করেছিলেন। জ্বরের দানব জ্বরাসুর নামে এক অসুর সমস্ত বাচ্চাদের মধ্যে জীবাণুযুক্ত জ্বরের প্রভাব বিস্তার করেছিল, ফলে বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে যেতে শুরু করল এবং তা মহামারীর আকার নিল। ঠিক সেই সময়ই দেবী কাত্যায়নী শীতলার রূপ ধারণ করে এসেছিলেন বাচ্চাদের রক্তে জীবাণু ধ্বংস করে সুস্থ করার জন্য। সংস্কৃততে ‘জ্বর’ অর্থে ‘জ্বর’ এবং ‘শীতল’ অর্থে ‘শীতলতা’ বোঝায়। এজন্য দেবী শীতলাকে জ্বরের অসুরনাশিনী দেবী, ঘেঁটুর দেবতা, চর্মের দেবতা, রক্ত সংক্রমণের দেবী, মহামারীর দেবীর সঙ্গে তুলনা করা হয়। এছাড়া শীতলাকে প্রায়শই ওলাদেবীর সঙ্গে পূজা করা হয়। ওলাদেবী যদিও কলেরা রোগের আরোগ্য দেবী। মা শীতলার আরো একটি রূপ দেখা যায় যেখানে মায়ের আঁটটি হাতে আঁটটা অস্ত্র রয়েছে, যথা — ত্রিশূল, ঝাড়ু, চক্র, জীবাণুনাশকারী পাত্র বা জলে ভরা পাত্র, বাঁকানো তরবারি, শঙ্খ এবং মুদ্রার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছেন। দেবীর দুই পার্শ্বদেশে দুটি গাধার অবস্থান লক্ষ করা যায়, এই চিত্রনেই দেবীকে সৌভাগ্য, সুরক্ষা প্রদান, সুস্বাস্থ্য এবং শক্তির দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

লোক-পরম্পরায় জানা যায় আদ্যা শক্তি মহামায়া দেবী দুর্গার একটি অবতার হলো দেবী শীতলা, যিনি বসন্ত রোগের দেবী নামে হিন্দু ধর্মে খ্যাত। ইনি হলেন লৌকিক দেবী ভারতীয় মহাদেশে বিশেষত উত্তর ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে বহু ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা উপাসনা করা হয় এই দেবীর। কেবলমাত্র বসন্ত রোগ নয় পক্ষ, ঘা, ব্রন প্রভৃতি চর্ম রোগের বিনাশকারী দেবীরূপে পূজিত হয়ে আসছেন। হিন্দু মতে দেবীর আরাধনা হয়ে থাকে দোলযাত্রা থেকে আট বা অষ্টম দিন পরে একে ‘শীতলা অষ্টমী’ বলা হয়। মায়ের পূজার নিয়ম বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মতানুসারে বিভিন্ন নিয়মে হয়ে থাকে। কোনো অঞ্চলে মায়ের পূজার দিন নিরামিষ রন্ধন হয় গ্রামের পরিবারগুলিতে, কোথাও বা আগের দিন রান্না করা হয় এবং পূজার দিন অরন্ধন পালন করা হয় গ্রামবাসীরা পাস্তাত আহার করেন। আবার কোনো অঞ্চলে মায়ের ভোগে আমিষ রন্ধন করা হয় তাই গ্রামবাসীরাও আমিষ ভক্ষণ করেন। কোনো ব্যক্তি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আরোগ্য কামনার জন্য গ্রামীণ হিন্দু সমাজের রীতি অনুযায়ী দেবীর নিকট প্রতিদিন পূজা দেওয়া হয় এবং সেই বাড়িতে হলুদ ছাড়া নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করা হয়। পূজার এই রীতিকে ‘বসন্তবুড়ী ব্রত’ বলা হয়। মাঘ মাসের ষষ্ঠ দিনে পঞ্জিকা মতে দেবীর আরাধনা করা হয় একে শীতলা ষষ্ঠী বলা হয়, তবে এই নামানুসারে পাঁজিতে কোনো ব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায়না আলাদা করে। শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজার পরের দিন ষষ্ঠী তিথিতে যে ব্রত পালন করা হয় তা শীতল ষষ্ঠী ব্রত নামে প্রচলিত। দেবী প্রচলিত মূর্তিতে দেখা যায় কল্যাণময়ী রূপ গাধার উপর বসে আছেন তাঁর এক হস্তে কলস অন্য হস্তে ঝাড়ু রয়েছে। ভক্তদের বিশ্বাস কলসি থেকে তিনি আরক্ত সুধা দান করেন এবং ঝাড়ুদ্বারা রোগাক্রান্তদের কষ্ট লাঘব করেন।

শীতলা প্রধানত উত্তর ভারতে ভীষণভাবে জনপ্রিয়। কিছুক্ষেত্রে তাঁকে শিবের সহধর্মিণী পার্বতীর রূপে পূজা করা হয়। শীতলাকে প্রধানত বসন্তের দেবী (গুটি বসন্ত / জল বসন্ত), ঠাকুরানী, জগৎরানী (বিশ্বচরাচর যার), করুণাময়ী (যিনি দয়া-দাক্ষিণ্যে পূর্ণ), মঞ্জালা (শুভ), ভগবতী, দয়াময়ী (যিনি করুণা দাত্রী) ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা হয়। দক্ষিণ ভারতে আবার শীতলার রূপান্তিত রূপ ‘মারিয়ম্মান’ বা ‘মারিয়াখা’ নিয়েছেন। মারিয়ম্মান হলো দ্রাবিড় ভাষীদের উপাস্য দেবী।

প্রাচীনকালে শীতলার কোনো মূর্তি পূজা হতো না। পূজারীগণ একখণ্ড পাথরে সিঁদুর লেপন ও ফুল দ্বারা দিয়ে শীতলা জ্ঞানে পূজা করতেন। ব্যোমকেশ মুস্তাফির বর্ণনা অনুসারে, শীতলা ছিলেন হস্তপদহীন খাতু খচিত সিঁদুর লিপ্ত ব্রন-চিহ্নাঙ্কিত একটি মুখাবয়ব মাত্র। আশুতোষ ভট্টাচার্য এই জাতীয় শিলা প্রতীকেই শীতলার প্রাচীনতম রূপ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে শীতলা প্রকৃত পক্ষে অনার্য সভ্যতা প্রসূত লৌকিক দেবী। প্রাচীন অনার্যরা পাথর খণ্ড বা কোনোপ্রকার প্রতীক যেমন কলসি, হাঁড়ি ইত্যাদিকে পূজা করত। বহু যুগ ধরে শীতলা

পূজিত হয়ে আসছে একটি কালো পাথর অথবা বট গাছের নিচে হলুদ কাপড়ে ঢাকা বেদীর উপরে প্রস্তর খণ্ড রূপে। কিন্তু মানব প্রতীম সূনির্দিষ্ট মূর্তি নাহলে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের চলে না। সেই মতোই ‘ব্রহ্মবৈবর্ত’ পুরাণে বলা হলো শীতলাকে কল্পনা করতে হবে রক্তস্রাব এক দেবী রূপে, যিনি ময়ূর বাহিনী, তাঁর হাতে ধরা একটি মোরগ, অঞ্চল ভেদে এই প্রতীমার তারতম্য ঘটে। কোনো কোনো স্থানে ছোটো পুতুলের আরাধনা হয়ে থাকে দেবীর অনুরূপ রূপ হিসাবে। ‘স্কন্দপুরাণ’ ও ‘ব্রহ্মবৈবর্ত’ পুরাণের মতো কয়েকটি প্রাচীন পুরাণেও শীতলার কথা উল্লেখ রয়েছে, সেখানে তাকে গুটি বসন্তের (স্মল পক্স) নিয়ন্তা হিসাবে দেখানো হয়েছে। যজ্ঞের আগুন থেকে তাঁর উদ্ভব ঘটে। ভগবান ব্রহ্মা কেবল শীতলাকে নয়, তাঁর সহচর জ্বরাসুরকেও পূজা করার জন্য মানবজাতিকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

নদীমাতৃক সভ্যতার পূজিত দেবী শীতলা। ‘স্কন্দপুরাণ’ অনুসারে গঙ্গা হলেন শীতলামৃতবাহিনী, অন্যদিকে শীতলাকেও অমৃতবর্ষিণী বলা হয়েছে। স্তবকবচমালা অনুযায়ী শীতলার পূজা জলে অনুষ্ঠিত করার নিদান পাওয়া যায়। কাজেই শীতলা জাহ্নবী গঙ্গার সঙ্গেও সমার্থক হয়ে যান। বৌদ্ধ ধর্মানুসারে বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে জ্বরাসুর এবং শীতলাকে কখনো কখনো পর্শবরীর সহযোদ্ধা হিসেবে দেখানো হয়েছে, বৌদ্ধ ধর্মমতে যিনি রোগ নিরাময়ের দেবী। জ্বরাসুর এবং শীতলাকে পর্শবরীর ডান ও বাম পাশে সজ্জিত করে দেখানো হয়েছে। কিছু ছবিতে বৌদ্ধদেবী বজ্রযোগিনীর ক্রোধ থেকে বাঁচতে এই দেব-দেবীদের পলায়নরতা অবস্থায় দেখানো হয়েছে।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর শীতলার মূর্তি পিচ্ছিল তন্ত্রোক্ত ধ্যানমন্ত্রের এক আধ্যাত্মিকমূলক ব্যাখ্যা করে বৈদিক অপ্ ও শীতলার অভিন্নতা প্রতিপাদনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তবে এক্ষেত্রে অপ্ জল বসন্ত রোগের দেবতা নন, তাঁর কোনো মূর্তিও বেদে বর্ণিত হয়নি। একথা স্বীকার করেও ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য জলকে ‘রোগ নিরাময়ের হেতু’ উল্লেখ করে অপ্ ও শীতলার পারস্পরিক সম্পর্কের কথাটি স্বীকার করে নিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি শীতলার মূর্তিতে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, ষষ্ঠীর ন্যায় পৌরাণিক দেবীগণের বৈশিষ্ট্যগুলির কথাও বিশদে আলোচনা করেছেন। ‘স্কন্দপুরাণ’এর অবস্তুখণ্ডে ও কাশীখণ্ডে শীতলার যে উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানেও শীতলার সঙ্গে জলের সম্পর্কের একটি আভাস রয়েছে। স্বামী নির্মলানন্দ শীতলার হাতে জলপূর্ণ ঘট ও জল মধ্যে শীতলার ধ্যানের বিধির প্রেক্ষিতে তাঁকে ‘জলাভিমানিনী দেবী’ বলে উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য তন্ত্রন অথবা অপের সঙ্গে শীতলার সম্পর্কের তত্ত্ব তিনি অস্বীকার করেন কারণ শীতলা হলো অনার্যদের লৌকিক দেবতা।

বর্তমানে প্রচলিত রূপ অনুসারে শীতলার মাথায় কুলো অলঙ্কারের মতো শোভা পায়। দেবতাদের দ্বারা তিনি সর্বদা স্তুত হচ্ছেন। তাঁর বাম হস্তে কুম্ভ, ডান হস্তে সম্মার্জনী বা বাঁটা। তিনি গর্দভবাহিনী, এক্ষেত্রে শীতলার বাহন গর্দভ হওয়ার কারণ হিসাবে দুটি মত রয়েছে, কবিরাজি চিকিৎসায় বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসাবে গাধার দুধ ব্যবহার করা হতো। অন্য মতানুসারে গাধা হলো শাস্ত স্বভাবের ও নিঃস্বার্থ ভাবে নির্বিবাদে কাজ করা একটি প্রাণী। গাধার এইরূপ কাজের বৈশিষ্ট্যানুসারে মানব সমাজের কল্যাণে রোগ আরোগ্যের দেবীর বাহন রূপে কল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া শীতলা দিগ্ধাস ধারণ করে বলে তিনি দিগ্ধারী নামেও খ্যাত। শীতলাকে কেবল বসন্ত রোগ নয় ম্যালেরিয়া রোগের উপসমের দেবী রূপে কল্পনা করেন বহু মানুষ, একারণে ম্যালেরিয়া রোগের দেবী ওলাইচণ্ডীর সঙ্গেও শীতলার যোগ সাদৃশ পাওয়া যায়।

বর্তমান সমাজে সকল নিয়ম-রীতিরই পরিবর্তন ঘটেছে। দেবী শীতলাও তার ব্যতিক্রম নয়, তাঁর পূজার ক্ষেত্রে প্রচলিত কিছু নিয়মের পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। অনেক লৌকিক দেবদেবী আছেন যাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়েছেন কালক্রমে এবং কিছু দেব-দেবী তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন বহু কষ্টে মাহাত্ম্য পরিবর্তনের মাধ্যমে, যেমন দক্ষিণরায় এখন কেবলমাত্র আর ব্যাঘ্র দেবতার নন, তিনি বর্তমান সমাজের মানুষের কাঙ্ক্ষিত

মনোবাঞ্ছা পূরণের দেবতা রূপে অবস্থান করছেন। এছাড়া লৌকিক দেবী হাঁড়িঝি চণ্ডী কেবলমাত্র এখন ওঝা-গুনিদের প্রয়োজনার্থে নয়, মানুষের চাহিদাও পূরণ করছেন। সেরকমই দেবী শীতলা অবশ্যই বসন্ত রোগের দেবীর আখ্যাটি এখনো পর্যন্ত হারাননি তবে বসন্ত রোগ ছাড়াও সন্তান কামনার্থে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বাসনায়, জমি-জমা সংক্রান্ত মামলা-মকদ্দমা ইত্যাদি নিরাময়ের দেবীরূপেও বর্তমান সমাজে গুরুত্ব পাচ্ছেন। আরো একটি নতুন তথ্য নামখানা ব্লকের শিবনগর আবাদ এলাকায় কাঁকড়াবুড়ি মন্দিরের সমীক্ষা করতে গিয়ে জানা গেল সেটি হলো, মায়ের মন্দিরে বিবাহ অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করানো হয়ে থাকে। যে সকল পরিবার তাদের মেয়েদের বিবাহ দিতে অক্ষম আনুষ্ঠানিকভাবে, তাদের এই মন্দিরে মাত্র ৮০০ টাকার বিনিময় বিয়ে দেওয়া হয়। পূর্ব নিয়ম অনুসারে কেবলমাত্র কালী মন্দিরে, দুর্গা মন্দিরে বিবাহ দেওয়া হতো, এখন সেটা শীতলা দেবীর মন্দিরেও সম্পন্ন হচ্ছে। ফলত কালোক্রমে মানুষের চিন্তাধারার যে একটা পরিবর্তন ঘটেছে তা বলাবাহুল্য। বর্তমানে আর্থসামাজিক পরিকাঠামো রূপান্তরের প্রেক্ষিতে গোত্রান্তর ঘটেছে এই সকল দেব-দেবীর। অতীতের চলে আসা সংস্কার, নিয়ম-রীতি-উপাচার সমস্ত কিছুই পরিবর্তন ঘটলেও মূল কাঠামোর অন্তর্নিহিত অর্থের পরিবর্তন ঘটেনি আজও, মানুষের সুস্থ সবল ও নিরাপদ ভাবে বেঁচে থাকার তাগিদ ও পার্থিব চাহিদা আজও অপরিবর্তনশীল।

তথ্যসূত্র :

১. ‘লোকায়ত সুন্দরবন- ১’, সুভাষ মিস্ত্রী, দিয়া পাবলিকেশন, ৮৮/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯
২. ‘পূজা পার্বণের উৎসকথা’, পল্লব সেনগুপ্ত, পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯
৩. ‘বাংলার লৌকিক দেবতা’, গোপেন্দকৃষ্ণ বসু, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩
৪. ‘সুন্দরবনের পূর্বপুরুষ পূজা (একটি সাংস্কৃতিক নৃত্যের বিশ্লেষণ)’, সঞ্জয় ঘোষ, প্যারালাল প্রেস, ২৮/৩/সি উর্মিলা কমপ্লেক্স (দ্বিতল), ঠাকুরপাড়া রোড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৭৪৩৩৩৭

বৈদ্যুতিন সূত্রাবলী :

1. <https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Shitala&hl=bn&sl=en&tl=bn&client=wa&prev=search>
2. <https://bengali.news18.com/news/south-bengal/kankra-madir-is-very-famous-in-namkhana-district-sr-391098.html>
3. https://www.kakdwip.co.in/2024/04/blog-post_27.html?m=1

লেখক পরিচিতি : পল্লবী সরদার, গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ।